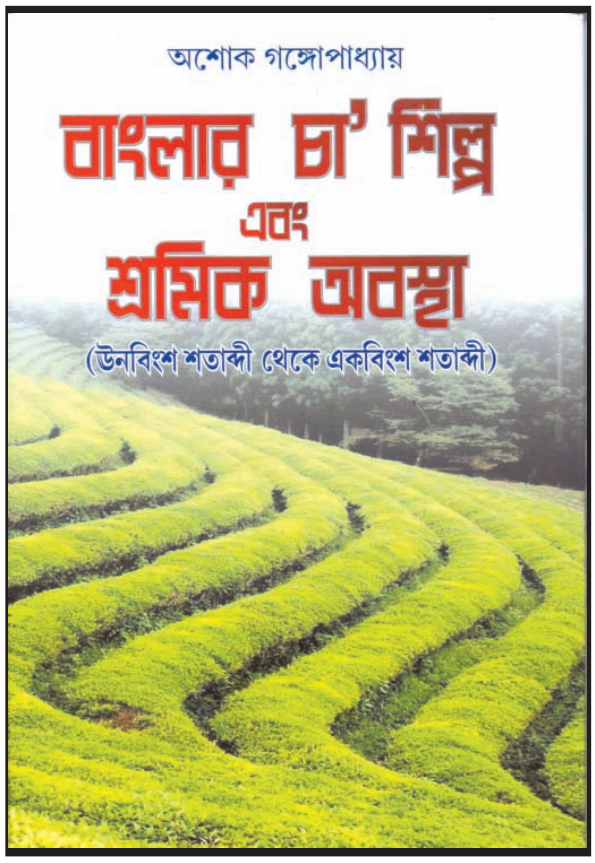

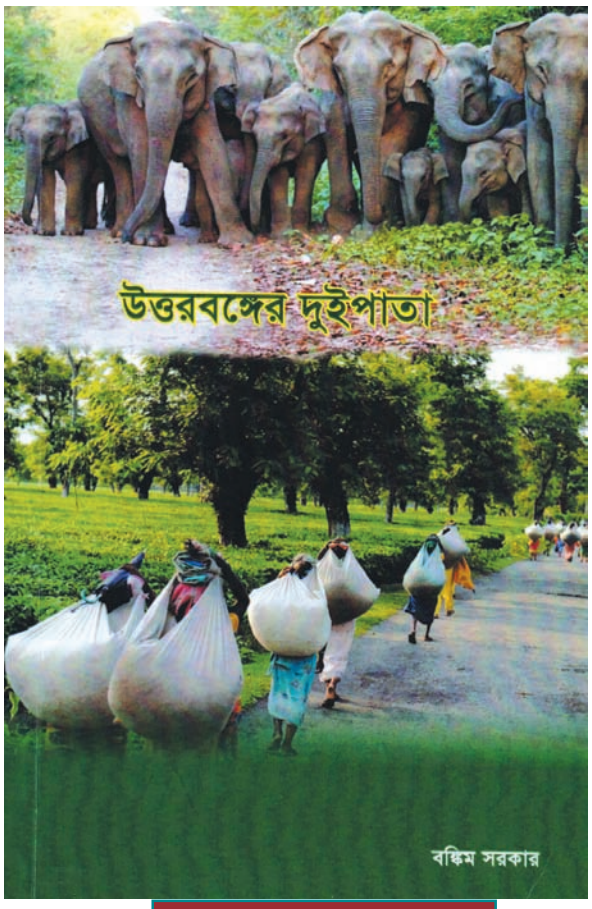

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বইতরণী

চা যখন শোষণের ইতিবৃত্ত

দক্ষিণের বারান্দা। সকালের সোনা রোদ এসে পড়েছে। সুখী দম্পতি হাসি হাসি মুখে চুমুক দিচ্ছেন চায়ের কাপে। চা বলতেই এমন একটা ছবি মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এসে দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্সের চা-বাগানের সবুজের প্রেক্ষাপটে পর্যটকদের হাসি হাসি মুখে ফটো তোলার রেওয়াজ আজও আছে। কিন্তু চা-বাগান তথা চা-শিল্পের বাস্তবের ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। একের পর এক চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেতন পান না চা-বাগানের কর্মীরা, অনাহারে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির শিল্পের সঙ্গে জড়িত নারী-পুরুষ-শিশু। এদিকে বিশ্ব বাজারে ভারতীয় চায়ের রফতানির পরিমাণ দিনে দিনে কমছে। সে জায়গা দখল করে নিচ্ছে চিন ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া।

চা-শিল্পে এই আঁধার ঘনিয়ে আসার চিত্রই প্রচুর প্রামাণিক তথ্য ও চার্ট সহকারে তুলে ধরেছেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলার চা-শিল্প এবং শ্রমিক অবস্থা' গ্রন্থে। সাতটি অধ্যায়ে তিনি বিন্যস্ত করেছেন শোষণ ও কান্না-ঘাম-রক্তের এক চলমান ইতিবৃত্ত। (১) বাংলার চা শিল্পের ইতিহাস ১৮৫৬-১৯৪৭। (২) বাংলার চা-বাগিচা শিল্পের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ-১৯৪৮-২০১৭। (৩) বাংলার চা-শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ। (৪) বাংলার চা-শিল্পে ছোট নাগপুরে শ্রমিক আগমনের কারণ। (৫) বাংলার চা-শিল্পে নেপালি শ্রমিক আগমনের কারণ। (৬) বাংলার চা-শ্রমিক মজুরি প্রসঙ্গ ১৮৫৬-২০১৭। (৭) বাংলার চা শ্রমিক অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী।

লেখক নির্দিষ্ট যুক্তি দেখিয়ে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন চা-শিল্পে উত্তরবঙ্গ তথা ভারতের পিছিয়ে আসার কারণগুলি। তাঁর বক্তব্য, চা উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতি ও স্বচ্ছ মানসিকতা না থাকলে ভারত আরও পিছিয়ে পড়বে। মালিকপক্ষ কথায় কথায় 'লক আউট' ঘোষণা করে, ক্যাজুয়াল কর্মী দিয়েই কাজ চালায়। চা শ্রমিকদের পি এফ-এর টাকা মজুরি থেকে কাটলেও সঠিক স্থানে জমা দেয় না। একশ্রেণির মালিক সরকার, টি বোর্ড, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কাউকেই পরোয়া করে না। বৃদ্ধ গাছ উৎপাটন করা হয় না। লিন পিরিয়ডে চা গাছের যত্ন নেওয়া হয় না। চায়ের মান বাড়াতে উন্নতমানের নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। লেখকের কথায়, একশ্রেণির মালিক কার্যত 'মাফিয়া' হয়ে উঠেছে (পৃষ্ঠা ৪৬)। চা যে একটা শিল্প ও সমগ্র ব্যবস্থাকে শিল্পের দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন – এই সত্যটি তারা মনে রাখতে চায় না। চা শিল্পে কান্না-ঘাম-রক্তের এই নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরার জরুরি কাজটি করার জন্য পাঠক কৃতজ্ঞ থাকবেন অশোকবাবুর কাছে।

আলোচ্য দ্বিতীয় বইটিও (উত্তরবঙ্গের দুই পাতা) চা শিল্প নিয়ে। লিখতে গিয়ে এই বইতে সবরকম আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন লেখক বঙ্কিম সরকার। কখনও যেন নাটক। কখনও উপন্যাস। বার বার বাক্য বিন্যাসের এ গলি সে গলি ঘুরতে ঘুরতে কেমন ধাঁধা লেগে যায়।

চা শিল্পের জীর্ণ অবস্থা এবং তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর ও সংবাদমাধ্যমের চর্চা এখন নিত্যদিনের বিষয়। কোনও সিদ্ধান্তই চা শিল্পের শ্রমিকদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারে না। দিনের পর দিন চা শিল্পের যেমন ধুঁকতে থাকা অবস্থা, তেমনই এই শিল্পের শ্রমিকরাও বনবস্তির কুঁড়েঘরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সংবেদনশীল হৃদয় নিয়ে লেখক বঙ্কিম সরকার সমস্ত বিষয়টিকে দেখেছেন। চা শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে। তবু সেই গলিত শব থেকে মাংস খুবলে নেওয়ার জন্য কিছু অসাধু মানুষ এক হয়। তারা জঙ্গল ধ্বংস করে। বন্যপ্রাণী হত্যা করে। নিজেদের মুনাফার জন্য প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করতে কসুর করে না। শ্রমিকদের ভালো মন্দ নিয়ে তাদের কোনও দায়ও থাকে না।

অন্যদিকে লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে থাকেন মাস্টারমশাই। তিনি বনবস্তির মানুষের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নিয়ে চেষ্টা করেন কীভাবে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখানো যায়। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে দেবী তার বাবার আদর্শে বড় হয়ে উঠেছে। সে বাবার কাজে সাহায্য করে। সঙ্গে থাকে মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র অতুল। বইটিতে বনবস্তির ও সেই অঞ্চলের অনেক চরিত্র ও তাদের অবস্থানের কথা বলা আছে।

একদিকে যখন কিছু মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা মানুষের ভিতরে শুভ বোধকে জাগিয়ে তোলবার। তখন অন্যদিকে বিপরীত প্রক্রিয়ায় বনবস্তির মানুষকে কাজে লাগায় কিছু অসাধু লোকজন। তাদের ইশারায় ও খিদের তাড়নায় বনবস্তির গরিব মানুষেরা হত্যা করে বনের পশু। জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটে। চা বাগান বন্ধ। কারও কাজ নেই এই পরিস্থিতিতে তখন আর অন্য বোধ কাজ করে না। এই অবস্থাকেই কাজে লাগায় লোভী মুখোশধারীরা।

এদিকে অনুপম ও চৌধুরীর মতো চরিত্ররা আসে কাহিনিতে। তারা নিজেরা যেমন উপলব্ধি করে পশুহত্যা, জঙ্গল নষ্ট করা ঠিক নয়, তেমনই অন্যকেও বোঝায়। তারা মাস্টারমশাইয়ের কাজকে সমর্থন করে।

> একের পর এক চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেতন পান না চা-বাগানের কর্মীরা, অনাহারে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির শিল্পের সঙ্গে জড়িত নারী পুরুষ শিশু

বিকল্প কাজের ভাবনায় আসে শুকনো পাতা দিয়ে থালা বানানো। মৌমাছি পালন করে মধুর চাষ। যে গাছের পাতা দিয়ে ওষুধ বানানো হয় সেই পাতা সংগ্রহ করা। এইসব কাজে যদি সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় এমন সম্ভাবনা নিয়ে ডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা বলার চেষ্টা করেন মাস্টারমশাই। এমন ইচ্ছে যে কোনও সংবেদশীল মানুষেরই থাকে, তাই মাস্টারমশাইয়ের মাধ্যমে লেখক যেন সেই স্বপ্নপূরণ করতে চান। ডি এম সাহেবের উপস্থিতিতে যে সভা হয় সেই সভায় যেন সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উত্তরবঙ্গের মহিমা চা বাগান। চাষের উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় বাগানগুলিকে আবার সতেজ করার আপ্রাণ চেষ্টায় সবাই সংঘবদ্ধ হয়।

এই অঞ্চলের মেয়েরা বাইরে পাচার হয়ে যায়। সেটাও এক সমস্যা। পশুদের চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করা হয়। এমন নানা বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন-মাফিয়াদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। রাজনীতির ফাঁদে পা না দিয়ে জীর্ণ শরীরের মানুষগুলি নিজেদের রুগ্ন হাতগুলিতে ধরে রাখবে হাজার হাতির বল। এমন স্বপ্নের কথাই উচ্চারিত হয়। এ জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

তবে বইটি পাঠ করার সমস্যা অন্যত্র। একজন লেখক কোন বিষয় নিয়ে বলবেন এটা তিনি ঠিক করবেন। কীভাবে বলবেন এটা যেমন লেখকের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে তেমনই একজন পাঠকেরও স্বচ্ছন্দ পাঠের চাহিদা থাকতেই পারে। বইটি পাঠ করার সময়ে এ কথা মনে হয়েছে বারবার।

বইটিতে ছবিগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দিলে ভালো হত।

বাংলার চা শিল্প এবং শ্রমিক অবস্থা ঃ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় । রক্তকরবী । ২০০ টাকা
উত্তরবঙ্গের দুই পাতা ঃ বঙ্কিম সরকার । প্রকাশক ঃ বঙ্কিম সরকার । ১০০ টাকা